হারগুঁজি
কবিতার ছোটকাগজ

সম্পাদক
রিদওয়ান নোমানী

প্রছদ
আল নোমান

যোগাযোগ
মুহুরীপট্টি, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০

মোবাইল
০১৬৪৪৩৩২৮৩৯

মূদ্রণেঃ
গোল্ডেল রেশিও কর্পোরেশন
৩৭/১-ক, ব্লক-এ, রোড-১, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

কবিতা কী জিনিস? সেইটা না লিখলেও চলবে। তবে কবিতা বলতে কী বুঝি তা না জানাইলে পাপ বৈ সোয়াব হৈবে না। কবিতারে পর জ্ঞান করলে অন্তত দোজখবাসের সম্ভাবনা নাই। আমি মূলত আমিতে থাকি না, আমি থাকি পরে। পর বা পড়শী না থাকলে আমার আমিত্ব টেকে না। তাই নিজেরে পরের মধ্যে খুঁজে বেড়াই। কবিতার সঙ্গে আমার এই পরকীয়ার সম্পর্ক নিয়া আপনারা বুজুর্গানে মজলিস বসাইতেই পারেন। হাল আমলে এর ফজিলত অনেক।

বর্তমান সময়ে যেইসব কবিতায় লোচন ফেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তার অধিকাংশই নব্বইয়ের গুণে পুষ্ট আর একাংশ হাংরির মেজাজে দুষ্ট।
কবিতা ব্যাপারী মাত্রই জানেন, কথাটা সত্যের কাছাকাছি। তাছাড়া, সুবোধ সরকারদের ধারক বাহকেরও আকাল নাই। যদিও আমি এইটারে ধর্তব্যের মধ্যে রাখি না।

আঙ্গিক ও বিষয় ভাঙ্গার স্লোগান সব আমলেই একটা জেনারেশনের মুখে থাকে। মার্কিন মুলুক থেকে ধার করা লিটলম্যাগ ধরতাই বাংলায় বলি ছোটকাগজ, যা বিগত জেনারেশনের মুখপত্র হয়ে আসছে।

হারগুঁজি সেই ধারাবাহিকতারই নতুন কোশেশ মাত্র। স্মর্তব্যের বিষয়, হারগুঁজি পটুয়াখালি অঞ্চলের একটি কাঁটাযুক্ত পাতার নাম, যা বিলুপ্ত প্রায়। হারগুঁজি ভাঙলে আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় গলার কাঁটা, যা লিটলম্যাগের বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে।

তেইশজন কবির কবিতা নিয়ে হারগুঁজির প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, যাদের সবার জন্মই খ্রিস্ট পঞ্জিকার ১৯৯০ সনের পরে। এদের লেখার ভেতর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আছে, ভাঙ্গার স্বপ্ন আছে।

কয়েকজনের কবিতা যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে রাখতে পারি নাই। আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে দোয়াপ্রার্থী।

এই কাগজখানা বের করতে যেইসকল মহাত্মারা এলেম, কবিতা আর অর্থ দিয়া সহযোগিতা করছেন, ভীতুর ডিমরে নানাভাবে সাহস দিছেন, তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। যাঁদের নাম না লইলে আল্লা রাব্বুল আলামিন বেজার হৈবেন, তেনারা হইলেনঃ কবি মনির ইউসুফ, এহসান হায়দার, (বাজস সভাপতি) মাহফুজুর রহমান শামীম, পলাশ চন্দ্র দাশ, আজিম ভুঁইয়া, অয়ন আবদুল্লাহ, বিপ্লব হোসেন খান, সাদী সৈয়দ, আজমুল জিহাদ, দিপংকর মারডুক, ম্রিতোষ তত্রাচ, নাদিয়া জান্নাত, মুহাম্মদ আবদুল আলিম । বিশেষভাবে কৃইতজ্ঞ শিল্পী আল নোমান ভাইয়ের কাছে।

প্রিয় পাঠিকা, কাগজখান পড়ার পর উড়াইয়া দিয়েন আকাশে।

উৎর্সগ

কবি সৌরভ মাহমুদ্

বসন্তের আগে উইরা যাওয়া পাখি!

(জন্ম: ২রা এপ্রিল, ১৯৯৬- মৃত্যুঃ ২২ জানুয়ারী, ২০২২)

মিতোষ তত্রাচ

ওঁ

১

রিজার্ভ খুলে দেখি অজস্র প্রবাসী লাশমরা গাছের বাকলে আশ্রম খুলেছে পোকাব্যাকটেরিয়ার অক্লান্ত শ্রম চেটেপুটে খাচ্ছে কাস্টোমার।

২

গতকাল একটা সেতু ভেঙ্গে পড়লো। একটা সেতু অর্ধমির্মিত রেখে পালালো কনট্রাকটর। উদ্বোধন হলো নতুন কিছু সেতু। সড়কে গ্যাস লাইন ও নর্দমার পাইপলাইন। খোঁড়াখুঁড়ির উন্নয়ন চলছে... চলবে... এসব নিয়ে সেতু ও সড়ক বিভাগের তুমুল; ক্যাচাল? মহাসড়কে আটকে আছি,এ্যাম্বুলেন্স চিৎকার করতে করতে থেমে গেলো, হঠাৎ পৃথিবীকে গ্রাস করলো আশ্চর্য আর্তনাদনোলক হারালে যেমন নতুন বউ দেখতে পায় সংসার হারানোর দুঃস্বপ্ন! নিজের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি গতকালের সাথে আজ, আজকের সাথে আগামীকাল, কারো সাথে কারো দেখা হবে না কিছুতেই। তবু সেতুবন্ধন কী দৃঢ়! লৌকিক অবসর ঘিরে ফেলছে আমাকে হায়। ঈশ্বর, তোমার স্বরের কম্পমান ভলিউমে জেগে আছি- দূর বিষণ্ন সবুজ আঁকাবাঁকা ছলাতছল কোনো ভিনগাঁয়ে বিপন্ন রাতের পেটে।

ত্রিশোগোডাউন

সাদা বক উড়ে গেলো এইমাত্র
ওপারে কাউয়ার চর
সবুজ অরণ্যের দম বের হচ্ছে চিমনীর ধোঁয়ায়।
কীর্তনখোলার বুক কাঁপে থিরথির ঢেউয়ের ফণায়
কচুরিপানার ডুবসাঁতার
প্লাস্টিকের বোতল!
মাথা নিচু করে পালাচ্ছে
ভিষণমাঝি ধরেছে হাল।
এখনই ঝড় উঠবে
হোগলাপাতার বনে মেঘেরা মাতাল।

দিপংকর মারডুক

বাইজিবাড়ির মেয়ে

১
কে পাঠালো চুলখোলা কৌশল
জীবনের প্রীতিভোজ! তুমি শুয়ে পড়ো
শুয়ে পড়ো চিৎ হয়ে মহাপ্রাণ, অর্ধনির্মিত সবান্ধব
যে আমি স্মরণ করি উলঙ্গপ্রায় দুধমাখা পরিস্থিতি
কীসে আমার শয্যা? চারপাশে বর্ণনার মহাকাশ
দেখি, চলি শিশুদল অনুসরণ করে
অথচ বকুল আজ স্নানঘাটের মুখশ্রী

খুব এক মেঘ ও মেঘে নগ্ন পিদিমের বন
এই দূর নগরে মীনরাশি ভার মেয়ে
বসে আছো ঘরে ফেরার প্রতিধ্বনি ফেলে
যেন মনে ধরো মৃত্যু, নির্বাসিত মৃত্যু
সবুজ আয়নার মধ্যভাগে

২
ভাবছো সকালের কথা মনে হলে উন্মুক্ত পৃথিবীর কথা মনে পড়ে

হাঁটাহাঁটি দিয়ে মানুষ কত আর যাবে কাছাকাছি
আজ যেন তুমি শূন্যতত্ত্বের ঘুমে পুলকিত
বাড়িওয়ালা থেকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা পর্যন্ত

তবু তোমার কৃষ্ণবর্ণের উপহাস
রেখে গেছো বাইজিবাড়ির মেয়ে

ফরহাদ নাইয়া

জেরুজালেম

১

হৃদয়ের মতো বড় সন্ত্রাস আর নাই। সব সময় সে কেবল রক্ত নিয়া খেলা করে। তবু তারে ভালোবাসার সিম্বল হিসাবে দাঁড় করানো হইছে। মানুষ কি তবে রক্তই ভালোবাসে?

২

ঘুমিয়ে গেলে কি আর ঘুমে থাকা যায়? ঘুমের ভেতর আছি জেগে। সেখানেও কেউ কেউ ঘুমিয়ে আছে, তারা আর জাগবে না। তাদের পানপাত্র মদের তৃষ্ণায় কাঁপছে। তাদের দেহভান্ড চুরি হয়ে গেছে। তারা হৃদয় নিয়ে নিদ্রায় উড্ডীন।

৩

যে কথা হয়নি বলা
মরে পড়ে আছে দন্তমূলে
দাঁত তুলে দেখো
সেসব কথারা ছিলো টগবগে ঘোড়া
তোমার দিকে ছুটতে ছুটতে
ঠোঁটের বিশাল গেটে ধাক্কা খেয়ে শহীদ হয়েছে।
শহীদ কথারা আমার,
তোমাদের ব্যাপারে জানবে না কেউ
ভাষার খড়ম খুলে কেউ দিবে না ফুল।
তবু এই দরকারি মৃত কথাগুলো
তার খোঁপায় গুঁজে দিব।
কানের খুব কাছে দোল খাবে
মরা ভাষা।
কিন্তু সে শুনতে পাবে না কিছুই,
বিপুল নীরবতার কোলাহল খুলে পাতা উড়ে যাবে
সমূহ শীতকালের দিকে।

নাদিয়া জান্নাত

হুইসেল

নারীর বুকে কমলালেবু বসিয়ে
ঈশ্বর তাক করে আছেন রাইফেল।
চোখ বন্ধ করার সময় এখন নেই।
কারণ, আমি নারী।
আমার সামনে মাননীয় ঈশ্বরের হাত।
ডানে-বায়ে পুরুষ সহযোদ্ধা,
যারা কমলালেবু খেতে ভালোবাসেন।

আড়ালে সমুদ্রস্নানের ইঙ্গিত কু-প্রস্থাব।
সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ধর্মপ্রাণ ঈশ্বর।
শুনতে পাই কোন অদৃশ্য ডাক...
বেশ্যা নাকি? লাথি মেরে ফেলে দে সভ্যতার চাদর।
এসময় নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখা মুশকিল।
যে কোনো সময় গুটি চলে যেতে পারে গর্তে।

সামনে অদৃশ্য অক্ষর।
পোয়েটিক ম্যাডনেস।
ভূগোলবিদ্যা ভুলে গিয়ে আমি
জ্যামিতি আওড়াতে পারছি না।
ছুটে চলা ট্রেনের মতো প্রতিবাদ নামক শব্দটি
অনবরত হুইসেল বাজাচ্ছে আমার মাথায়।

মন হইলো জংলা ফুল,
চিনিচাঁপা গাছে ঝুলে আছে

বিষ্টি বাদলা, চুলায় রান্ধা কষা হাঁসের মাংস, পয়লা ফোটা গন্ধরাজের ঘ্রাণ ছেড়ে রোদ মরে যাওয়া পাহাড়ি উঠোনে মন পড়ে আছে।

ইকরি মিকরি খেলার ভেতর যা হারিয়ে ফেলেছি, তার দরদি গন্ধে তরতাজা হয় পা পিছলে যাবার ভ্রম।
পুনর্জন্মে বিশ্বাস নেই। থাকলে, পারাপারহীন কলাপাতায় ভাপিয়ে নিতে পারতাম ফুলঝুরি পিঠা। সম্ভাবনা না থাকায়, কাদা ছড়ানো রসুই ঘরে মলিন মুখে বসে আছি।

খড়ের স্তুপে পাখি বাসা বাঁধে, এমন ভরা মাসে কৌটার ভেতর তরতরিয়ে ওঠে মাসকলাইয়ের ছলনা। ঘর সংসারময় দীর্ঘ দৌড়ের ঐপাশে আমার যাবতীয় মরণের সাধ। জাগতিক সুখের দিনে মোলায়েম বাতাস হরতকির বনকে দরদ দিলে তুমি-আমি পাহাড়ে পাহাড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি যেন।

রুমানা জান্নাত

মিস করি সিনট্যাক্সের বাইরে, তোমাকে

১৬

মধুপুর জঙ্গল শুয়ে আছে। অকস্মাৎ পিঁপড়ার ঢেলা, শামটানো ঝরাপাতার কাছে বৃষ্টির সম্ভাবনা শুনেছি। যে বাড়ির নাম বেহালা- তার সফল করুণা এই, আমাদের বাজির ফলাফল এখনো শূন্য। শুধু বন্ধুর হাত ধরে হাঁটি। বেলা পড়ে যাচ্ছে। বয়স বাড়ার মতো সহজ সন্ধ্যায়- লিখেছো, জটিল করো না মানে। আমি দৌড়ানোর কোন ভঙ্গিমাই রপ্ত করিনি।

২৮

তোমার শৈশব দেখতে ইচ্ছা করে। পেন্সিলের ভাঙ্গা নিব, কবুতর খুঁজতে থাকা বিকাল আমি কল্পনা করেছি। ওই পুরানা গড়ের মাঠ আমার বহুবার দেখা। তোমাকে লিখেছি, একটা ছবি হয়ে থাকা শাপলার বিলে কখনোই যাওয়া হয়নি আমার। আজ

পাশাপাশি থাকার সত্যতা জানি। সন্দেহও। জানি, তোমার তাকানোর ভঙ্গিমা কত যুগ ভারি। তোমার বড়শিতে গেঁথে থাকা বৃষ্টির মাস, বেদেনির মুখ- আমাকে আচ্ছন্ন করে। তরুণ হয়ে আসা মুখ, ভাঙা স্বর আমি শুনতে পাই। মনে হয়, তোমার ছেলেবেলা থেকে একটা বাতাস এসে আমাকে ছোট্ট হলুদ ফুলের মতো দোলায়-

২৯

আজ শহর এমন আলো হয়ে আছে যেন আমরা পাহাড়ের দেশ থেকে বনফুল এনেছি। মেঘের দানার মতো বিকাল, তিনটা কুকুর সার ধরে ঘুমিয়ে আছে- আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার মতো বাতাস এখন- মোড়ের গাছটায় নতুন পাতা! কোনো কথা বলবো না। হলুদ বাড়িটা আরেকটু হলুদ হয়ে চেয়ে থাকবে। আমাদের পাশাপাশি হাঁটা এতই সহজ দৃশ্য আজ যেমন- আমরা বড় হয়েছি কেবল সকাল হলে জানালার পর্দা সরাবো বলে, এভাবেই টুকটাক লিখবো। যখন তোমাকে লিখি, গলির রাস্তা আর জানালার বর্ণনা দিলেও একটা প্রেমের দৃশ্য তৈরি হয়।

অনুভব আহমেদ

বল্কলহীন

নীলের তলায় পোড়া পোড়া খণ্ড খণ্ড দেহ
ঝলসে গেছে তিরস্কারে, অবমাননায়
মিথ থেকে বাস্তবতায়

যত যাই নামে ডাকো-
শেষ পর্যন্ত সকলেই বর্গি
বয়স পার হলেই পরিষ্কার হতে থাকে আকাশ

দূরে যাই শুধু দূর
মুখ ফিরিয়ে রাখি
ভাবি-
আশ্বিনের কোনও মাঠে
তোমার হৃদয়ে কাঁশ হয়ে দুলছি।

নাভিশ্বাস

একটুখানি পরশ দিয়ে অনেকখানি দূর
বনের ভেতর দুলছে পাতা, ক্লান্ত কোনো ফুল
হলো মনে শীতের হাওয়ায় নামছো তুমি খুব
উর্ধ্বগামী বাজার দামে বিষণ্ণ দু' কুল।

তোমার কথা নতুন করে যাচ্ছে না আর বলা
চারিদিকে ঘনিয়ে ডাকে বিষাদ হরবোলা
কপাল ভাঁজে টনটনিয়ে বাড়ছে জীবন ভার
তুমি যেন এই বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার!

মুহিন তপু

আত্ম

এই জন্মের দায় সারাতে বর্ষাকাল আদায় করছে গতজন্মের পাওনা ঋণ। আগামী জন্মে হাওয়াঘরে জলে ভেসে আসে যেন পূর্বস্বরের সোনালী দিন। তাইতো আমি খালি পায়ে যাচ্ছি হেঁটে, অরণ্যগ্রাম। তোমায় দেখে অবাক লাগছে! আলোর গ্রামে হারিয়ে যাওয়া ছায়া। তোমারও কি হয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি? ভালোই হলো, আবার দেখায়। আবার কথায় ফুটছে দেখো রং বাহারি। আবার বাজছে ধীরে আঙ্গুল, ফাল্গুনীচাঁদ ধানের ক্ষেতে। ধানের ক্ষেতের আইল পেরিয়ে ওটা তোমার শশুরবাড়ি? বললে নাতো! সমস্যা নেই। খানিক আগেও আড়ি দিয়ে বাপের বাড়ি, মায়ের বাড়ি, শশুরবাড়ি ছেড়ে, এই যে তুমি বড্ড একা ছিলে। এখন তো বেশ সঙ্গী তোমার বাড়ছে ধীরে ধীরে। ভয় পেও না এবারো আমি ভাসান হবো ঘোর বর্ষাকালে, গায়ের চাদর এবারো দেবো কাঁপতে কাঁপতে খুলে। ভয় পেও না, এবারো আমি ভাসান হবো, একলা একা, সোনালী দিনের লোভে। পার করে দেবো কড়িবিহীন
তোমায় ওগো, বাসনাঘাটের মেয়ে।

বোবাপাথর

তুমি শান্ত ছেলে, খুব আদুরে, পড়ো বড় ক্লাশে আর ঢিলেঢালা জামা। তুমি মন বাঁদুরে, দস্যি ভীষণ খাও মনে মনে মনকলা। তোমার একলা লাগা রোগ। তোমার একলা লাগা রোগ। তোমার পাথর ডাকনাম, তবু ভাসো তুমি দিনদুপুরে জলে ভেজা বুক। তুমি খসে যাওয়া তারা, তুমি নিজের কাছে ছোট ছোট নিজের বদনাম। তুমি পোষো নিজের ভেতর নিজের মরা শোক। তোমায় মাতিয়ে রাখে সুই-সুতোদের পাড়া। তোমার হয়ে গেছে একলা থাকার স্বভাব, তুমি হয়ে গেছো বাউন্ডুলে, লুকিয়ে ফেলতে পারো হু হু কাঁদা শোক। বোবাপাথর, বোবাপাথর। তোমার ঘুমের ভেতর কথা বলা রোগ। তোমার ঘুমের ভেতর কথা বলা রোগ।

ইয়ার খান

কথা

পরপর নিঃশব্দের মাঝে
যে দৃশ্য ফুটেছে সদ্য
তার বিগত শুনেও কাঁপন লাগে
গহীন ছিল
অপর ছিল
ডুবে ছিল প্রজ্ঞা জলে
কী এমন ঢেউয়ের মোহে উঠে এলো শিকারী মুখে
এখন হাওয়া সাঁতরে কান থেকে ধ্যান ছোবে
মানুষের তবু ফেরা হবে না যৌথ ভাষায়।

বিহাইন্ড দেয়ার সৌল

উপেক্ষার যত গভীরে নামি
কী যেন মাংস বিতাড়িত ক্ষত
ডেকে ওঠে বৈদ্য ভাষায়
মনে হয় কোনো তারাই ঘটমান নয়
সবই সংশয়ের গুমনামি

এত যে ক্রিয়াপদে হাঁটি তার কতটুকুই বা পুনঃশ্চ আমি?
বিস্ময়ে আতংক করি
হাওয়া সয়ে সয়ে পাথরও নুড়িপথে বরবাদ
কই, মানুষের চোখে তো ফুরালো না অনন্তের চাষাবাদ!

সৌরভ মাহমুদ

লিডার

কৈশোরে হারিয়ে যাওয়া বাইসাইকেলে ভর করেছে এই চাকা- মৃত্যুর আদরে বোঝাই ঝুড়ি- এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে আমার ভাই- এখানেই তার লোহার বাসর- জীবনের সকল মুখোশ ক্লীশে হয়ে হয়ে কীটের মতো বুকে ভর দিয়ে পড়ে আছে- আর মৃত্যুও যে শীতল দাবানল হয়ে যেতে পারে- বোতামে ভয় বাঁধা আস্তিন গুটিয়ে যেতে পারে, খুব জেনে গেছে আমাদের লিডার। আমাদের লিডার খোদার পরে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছে- মৃত্যু আর জীবনকে সে তার আঙুলের কাছে করেছে অবনত- তার কাছে বোবা হয়ে যাবার অধ্যয়ন করেছে ভাষা। এই পলিজমিনকে তিনিই করেছেন উর্বর–
রক্ত আর লাশের ফসলে ভরা ভাঁড়ার দেখেই আমাদের ক্ষুধা উবা গেছে- আমরা ক্রমশ ঢুকে পড়েছি জাদুবাস্তবতার ভেতর। ঘুম ভাঙা শিশুকে জানানো হয়েছে পিতা বলে কেউ ছিলো না- এই স্বর্গভূমিতে একজন পিতা- আর কেউ কখনো হবে না। তবু লাশগুলো দেখো পিতাদের মতোই সুরতে- মাথা না নোয়ানো ভঙ্গিতে শুয়ে আছে- আর আগত অনাগত সন্তানেরা এই লাশের পাশে দাঁড়াতে শিখে গেছে- তারা আজ লিডারের চোখের দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়েছে- তারা তোমার সেই ভয়ংকর কালনাগিনী রূপ দেখে ফেলেছে- তারা খুঁজছে- তারা খুঁজছে- ১৩ বছর ধরে বোবা ভাষা থেকে তারা খুঁজছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গালিটা কেবল তোমাকে দেবার জন্য।

মাদার

এই গা ছমছম সময় হয়ে একটা ঘড়ির ভেতর বন্দি হয়ে যায় আমাদের না গাওয়া গান আর অলেখা কবিতার মেটাফোর- ধারে কাছে যে কোন জলের পিছে যেখানে মন নাচে- সেখানে থৈ থৈ আগ্রাসনের বিমুখ বেদনায় কাতর নদীগুলো বাঁজে- আর
আমাদের বাইসাইকেল চুরি হয়ে যায় উপযুক্ত সকাল সন্ধ্যায়- সেই সাইকেলের বেল মগজের ঘরে টুংটাংটুং ধ্বনির মতো বিভ্রম হাজির করে- আর এই শ্মশানপুরীর শেষ পাহাড়ি নারীর ছিন্ন শরীর তবু ঝর্ণা ঠিক বয়ে নিবে- অনেক ব্যথার বালুচরে আটকে থাকা স্টিমারের জীবন এখানে এক ড্রাকুলার হাতে রক্ত দান করে মহৎ হয়ে যাবে। এতো মুখোশের এই মেলায় কাফকা বারবার পথ হারিয়ে ফেলছে- গ্রেগর সামসু এসে সামসার ভূমিকায় তাক লাগিয়ে দিচ্ছে- যেনো একটা একটা করে লেমনজুস চুষতে চুষতে আরও চোষার প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে- এরকম ভেলকির এক ভোট বাক্সের গায়েবি ঢিবিতে তবু নৌকায় ভোটের মতো লাশ বাড়ছেই, বাড়ছেই, বাড়ছেই- ক্রমাগত জীবনের সাথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে- অমুকের আম্মার
মতো।

মারমেইড

শোনাও সেই তীব্র করুন সুর,
পৃথিবীর সব সুফি মরে গেছে যেই গানে।
আমাদের নীল কণ্ঠ পেরিয়ে ভোর,
উঠান ডিঙিয়ে রঙিন জলের বুনন-
পদ্মকুমার নির্দেশ করে ঢেউ- আলোর পথে উজ্জ্বল মারমেইড-
মাঝ রাস্তায় সুইসাইডের দেয়াল।

আরও কিছু রক্ত নদী, লাশ-
আরও কিছু জীবনবাদী গান।
মিছিলে হারিয়ে যাওয়া ধাতব পায়ের খোঁজে-
মধ্যরাতে স্ফটিক ঘুম ভেঙে যাওয়া।

আঙুল তবু আঙুলের দিকেই ভ্রমণ-
আদতে জল, আদতে ঢেউ, আদতে মিথ্যা তুমি-
সত্য শহরে মিথ্যাই আমার পথ।

উজানের সুর শুনতে পাবে না তুমি-
মারমেইড ধরো তুমুল বিরহী গান,
ভেঙে দাও জীবন বিন্যাস-
তুমিই আমার তীব্র জলাতঙ্কের নাম।

উঠান ডিঙিয়ে রঙিন জলের বুনন-
আমার জাহাজ তোমার ভিটার দিকে,
অতল জলের ঘ্রাণ- এই শরীর সইতে পাবে না জেনেও-
তোমার দিকেই জীবনের উত্তাল সাতার।

প্রিয় মারমেইড চুপ করে বসে থাকো-
ভোর হবার আগেই ছিড়ে দিবো এই পাল।
তুমি-আমি হাইফেনে একটি সুইসাইডের দেয়াল।

শতাব্দিকা ঊর্মি

দৃশ্যে

জমে থাকা দৃশ্যেরাও ঘুমের সীমানা ভেঙে ঝরে পড়ে দম ফেটে যাওয়া অনন্ত বিরাগে। খড়বিচুলির জীবন তবু, অমিতাভ নীল ছুঁয়ে আসে কোন ডাঙুলি দুপুর-ভেদ করে যাপনের আলেখ্যদর্শন যেইখানে তুমি আমারে জানো নাই কোনো নির্মল হাওয়া সুরে, আরও দূরে কেটে যাই যাই মেঘ ঘন আব্রু ভেঙে ঝরতেছে জ্বলে নিদারুণ, যেন ব্যথার পাহাড় থেকে ছায়াময় মালিন্যরেখা, যেথা বুলবুলি বিকেল তুমি দাঁড়ায়ে রয়েছো চির একা গহীন সন্ধ্যার পাশে। জলের মত প্রাচীনতর কোনো আবেশের শেষে তুমিও ভেসে উঠছো যেন এক অধরা তীর্থ, যে মোর স্বপ্নে এসে ভঙ্গ করে যাবে অপার জীবনের মোহগান।

মরশুম

কোন মধ্যপ্রাচ্যীয় হাওয়ার মত দিন আজ, মেটে মেটে রঙের ভেতর, কি যেন শীতল উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে, দূরে। সাময়িক সুরের ভেতর গুলিয়ে ফেলা পুরনো গানের বৈভব, মেঘ ছিরে উড়িয়ে নিল হাওয়া রোমন্থিত মনের পালক। যেন সানাইয়ের মৌসুম আজ, কাচা হলুদ সন্ধ্যায়, টং এর মোমের সাথে গলে যাবে এক অপার প্রার্থনা। এক অপভ্রংশ কবিতার শব্দসব জুড়ে যাচ্ছে একটা পুরনো ফ্রেমে। কেঁপে ওঠা পাতার পাশাপাশি দুটো চোখ সামুদ্রিক গহীন। আর তাক করা তীর্যক সম্ভাবনা হৃদয় বরাবর। তারপর তবু আলো, দিন নামে ডকে আনা সাক্ষাত ইবাদতে ফুটেছিল বকুল, যে ঘ্রাণের ভেতর আজও বেজে যাচ্ছে এ জীবন-প্রাণময় বন্দেগি।

সুরমতি

আমাদের দূরত্বের মাঝে বেজে যাচ্ছে তিনটি গান, শেষ হাওয়া থেকে তুলে নিয়েছিলাম এক অমর ঘ্রাণ, উন্মাদ তুফান শেষে দেখেছি ঝরা ফুলদল। আরও নিঃশব্দের কথা ভেসে যায় ঠোঁটের আঙিনা ঘেঁষে, যেন আবার জন্ম নেব আগাম সূর্যাস্তে। সভ্যতা ভাঙা গুপ্তচর হয়ে বসে থাকি, যত দূর্লভতার পাশে। আর চেয়ে দেখো ব্যথা চির-অমিতাভ এইখানে , যেখানে নাবিক স্তব্ধভাষ্যে যা কিছু করেছে বিশেষণ।

আবির আবরাজ

একজন হয়ে থাকি

একটা চোখ তোমারে দেখলে তার সঙ্গে অন্যটাও দেখে- একটা হাত ছুঁয়ে ফেললে অন্যটাও ছুতে চায়। একটা ঠোঁট একা তোমার ঠোঁটের কাছে যায় না, যেন তার কীসের ভয়; ফলত, দেখি চারটা ঠোঁটের সমন্বয়। একটা পা দিয়ে তোমার কাছে যেহেতু হেঁটে যাওয়া যায় না- সেহেতু অন্যটাও তার অনুবর্তী হয়। দেখো, আমিও তো একটাই মানুষ, পাখি- তবে কেন যতবারই তোমার কাছে যাই, দু'জন না হয়ে কেবল একজন হয়েই থাকি?

সমুদ্রের কাছে

গ্লাস হাতে
চাপকলের কাছে গিয়া পুকুরের গল্প বলি
এক গ্লাস পানি চাইতে সে
নদীর কাছে গেলে বলে সমুদ্রের কথা।
জানি
ঝর্ণাকে যে দেখায় পথ
নদীর জন্মদাতা অথবা দাত্রী- সে পাহাড়
সে'ও এ ব্যাপারে একমত
নদীর শেষ আশ্রয় সমুদ্র
গ্লাস হাতে, কল হাতে, পুকুর আর নদীরে নিয়া সবাই
আমরা সমুদ্রের কাছে যাই;
জানি, সেই সমুদ্রেরও শেষ আছে কোথাও না কোথাও
কোনো শেষ আশ্রয় নাই।

জবা রায়

মৌখিক প্রশ্ন

এ কেমন ফেলে রাখা চোখ
তেরোটি সত্যকে শূন্য করে
এইমাত্র বুননের ট্রেন নিয়ে ছুটে গেলো
নিদর্শনের স্টেশনে।
সে দেখলো,
ভুয়া টিকিট হাতে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মন;
তাদের অভিযোগ-
ফিনিফিনে মাস্তুল হাতে অভিজ্ঞতা
ভেঙেছে চরিত্রের আয়না।
আর
জমাট কিছু স্মৃতির খুলিকে
প্ররোচিত করেছে তাঁতমহলের নীল সুতো।
তাই হলুদাভ দৃষ্টির ছাদে বসে থাকে
ত্রিকালসিদ্ধ বেড়ালে স্বভাব,
যে কিনা শিউরে ওঠা ভোর এলেই বোঝে,
শাক ও মাছ একে অপরকে ঢেকে গল্প শোনায়।
যান্ত্রিক বেদনার কলকব্জা চালু হলেই
সব শীত উড়তে শিখে ইল্যুশনের মাত্রা;
যোগে ভোগে শোক এনে তারা প্রশ্ন করে
কি মূল্যহীন এ জীবন, তাই না?

হোসেন হৃদয়

শুধু ফলাফল নয়

এই দোদুল্যমান অনিকেত–
কত দূর গেলে পাবো সেই প্রান্তর?
সারি সারি তমালের বন গহীন হয়ে আছে।

তার চেয়েও কাছে খোলা হ্রদ–
সেখানে জীবনের তাপে বাষ্প হচ্ছে পৃথিবী,
মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের কোন গ্রামে,
সেখানে আমার মানচিত্র মেলানো পেশা।

শিশু থেকেই মনে হয়–
যেন কোনো পাপ
আমি অবয়বে ধরে আছি;
আমি যেন প্রাণের কাছাকাছি এসে
ফিরে গেছি সেই গহীন তমালের বনে।

জনে জনে বলেছি- দেখো,
আমি পেয়েছি এই শরীর!
আমার চোখে দেখো কত অনুভূতি!
আমার দাঁতে সেইসব মাংসাশীদের ভিড়!
যারা এসেছিলো এই ক্ষেতে,
ফসলের খনি পেতে তারা উঠিয়েছিল ধান।
কাচির সাথে মিলনের ধারালো গানে গানে
কেটেছিলো তাদের আমনের মৌসুম।

আমিও ঠিক ততটাই মাতাল–
গভীর কল্পনার ভেতর সারাদিনের ঘুম,
ক্লান্তি নিয়ে জেগে ওঠা।
এই বিকেলের পরিহাস দেখে ভাবি–
আমিও তো প্রাণ, প্রাণের খনিজ!
শুধু ফল নয়, শুধু ফলাফল নয়,
আমি তার চেয়েও বেশি গতি–
আমি পৃথিবীর সব মানুষের মত হেঁটে চলা বীজ।

হোসেন রওশন

বাড়িতে মা থাকেন

মানুষের শূন্যতা নিয়ে বিবিধ আলোচনা শেষে জানা যাচ্ছে কপাল কেটে ফেললে আমাদের আফসোস কিছুটা কমতে পারে।
আর দুঃখ! তার পিছে বসায়ে দেই প্রশ্নবোধক(?)
দেখি যাত্রাপালার দিন শেষ হয়ে গেলে আমাদের পাড়ায় পাড়ায় বেড়ে উঠে বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না।

মানুষের বিরহের পাশে ফুল রাখি- কাঁটা হয়ে যায়।

দৃশ্যের শেষে ঘোড়াকে মনে হয় মিলিয়ে যাওয়া ইঁদুর।

আর ঘুম থেকে উঠেই তোমাকে দেখি, মায়ের মুখ মনে পড়ে।

বাড়ি মানে আপাতত মা।

নৈঋত শাহরিয়ার

ক্ষতিয়ান

আশ্রয় শব্দের সাথে যাদের যোগাযোগ কম তাদের চোখের দিকে তাকানোর সাহস করি না।
ওদের দুঃখের পাশে তুমি একটা গাছ দিও মাবুদ।
*
শিক্ষিত প্রতারিতার থেকে কলমভাঙ্গা বেশ্যার প্রতি
আরামদায়ক অনুভব-
*
পানপাত্রে বিস্তীর্ণ অমাবস্যা- 'ভুলে গেছি প্রথম সাক্ষাত সাক্ষাত মুহূর্ত সম্য তাং' অনির্দিষ্ট শোকের মড়িঘরে কাত হয়ে পড়ে আছি বর্ষশত বিদার।
দ্বার উন্মুক্ত হোক- প্রার্থনালয়, মদ বিক্রয় কেন্দ্র, ভগ এবং কসাইয়ের বাটখারায় মিলুক নিশ্চিত মাপজোখ।
*
বিদায় বলতে চাইলেই প্রভুরোষ- আয়ুর টার্ম জুড়ে ডিপ্রেশনের বর্ণমালা, পঙক্তিবুনতে গেলেই পূর্বসূরি ছায়া মায়া ভায়া শব্দের প্রতিধ্বনি, ঈশ্বর যা দেখেন তা দ্বি-দৃশ্য মানুষের স্ফটিক দৃষ্টিতে একচিত্রের সীমাবদ্ধতা।
*
অনিঃশেষ ছুতোয় পাঠ করি মনোবাঞ্ছা-
বিড়বিড়
বিড়বিড়
অনির্দিষ্ট শোকের মড়িঘরে
পড়ে আছি- বিদার,
এ মোহ টপকানো বয়সে হব নত
তাতে সমস্যা কার কার?

স্বপ্না রায়

উদযাপন

*

সন্ধ্যার ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি
যেন আড়িপাতা যুবতীর ঘরের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে এক আনাড়ি খেলাড়ি।
শ্যাওলার মতো পিচ্ছিল তার শরীর।

পশ্চিমা সূর্যের মতো নুয়ে পড়া আমার শৈশব
মেঘে ঢাকা আকাশের গর্জন
বর্তমান জেগে উঠেছে পৃথিবীতে
প্রতিটি শিরায় তার আগামী জন্মানোর ক্ষমতা নিয়ে।

*

একটা সস্তার সকাল বেয়ে তরতর করে উঠে
দাড়ায় পোড়া হৃদয়-
ঘুমের মুখোশের মতো দুঃখকেও ঢেকে রাখে যে
নাম-তাকে নিছক সুখ বলে ডাকে

এখানে বিষাদে ভর করে প্রার্থনায় জেগে ওঠে মৃত্যু
ধুনোর ধোঁয়ায় যেন স্বচ্ছ হয় চিতার আগুন
জীবন এখানে তড়পাতে থাকে
সামান্য মুক্তির আশায়

মধ্যবয়সী দুপুর
ঘোর কেটে গেলে আকাশ খুলে ফেলে তার বসন
গার্হস্থ্য বিরহে নতমুখ মফস্বল জীবন
যেখানে তোমাকে পেতে আমাকেই ছিঁড়ে খাচ্ছে আমার শোক।
এই সন্ধ্যা নামার পথে
সলতেখানি ডুবে যায় দূরের তীরে
কতখানি
ঠিক কতখানি
আকুলতা উদযাপনে
তোমারই নাম কীর্তনে রূপ নেয়
তুমি ঠাহর করতে পারবে?

হিমালয় অংকুর

*

কিছুদূর নাউনের পর
যেখানে
তোমার আমার ঘরবাড়ি নেই
ওখানেও তো পৃথিবীর কী মজার আশ্রয়।
তারপর দ্যাখো ঘুঘুর কথা-
ডিসেম্বরে
মেয়ে ঘুঘুটা কতো সুন্দর
লতাপাতার ভিতরে ডিম পাড়ার জন্য বসে থাকে।
অথচ কী শান্ত!
মাঘের কথা বলি-
মনে আর কী মাঘ,
শুধুতো ফাগুন ফাগুন।
বিড়ালদের খবর ভালো। ভালো কথা সব।
আর একটা আমগাছে দেখি আমের মুকুল।
বাচ্চা বাচ্চা মাছেদের সেই কতদিন থেকে দেখি না,
এরা মনে হয় বৃষ্টি ছাড়া থাকে না।
আলু। ধান। আখ।

রিদওয়ান নোমানী

উত্তর-ঔপনিবেশিক বেদনা

*

রাত হইলে ব্রেসিয়ার খোলার
পিনপতন নীরবতায় কলোনিয়াল
সিস্টেমের ভিতর হাঁপাইয়া উঠে
উত্তরাধুনিক পুরুষ...

*

আমরা ঘুমের নাম কইরা হ্যাঙ্গারে
ঝুলাইয়া রাখি পোস্টমর্টেম মগজ।

*

সিলিং-এ ঝুইলা পড়ার পর
হাতাইয়া দেখি বহুত
আগেই আত্মারে বেইচা
দিছি মাবুদের গোডাউনে।

*

জীবনে গাছ হওয়ার ইচ্ছা আছিলো প্রবল;
তবে না হওয়ার বেদনা নিয়া
যিশুকাল ধইরা
ছড়াইয়া যাইতেছি লতার মতো।

*

শীত আইলে একজনরে মনে পড়ে!
তাই কুয়াশা ভাঙার শক্তি লইয়া ঘুমায়া থাকি।
মোসলমানি মন কিবলায় নত হইলে
আল্লা হইয়া যান প্রাক্তন হৃদয়- আমি তার
কাছে নতজানু হইয়া ফিরা চাই বিগত সকাল...

তবুও মরিচ ক্ষেত দেখলে থমকে দাঁড়াই

তখোন হারিকেনের যুগ। খড়কুটোর ঘরে নাগরিক অভ্যাস তখনো আঁচড়ে পড়েনি। তখনো আম্মারা খাটালে পিঁড়ি পেতে উবু হয়ে গল্প করতেন...
ঝগড়ার মিহি সুতোয় আটকে যেতেন দাদিরা। চাঁদের কপালে টিপ দিতে দিতে অবলীলায় শিখে ফেলতাম অ আ ক খ। মুখস্ত পাখিদের নামে সন্ধ্যে হতো। খেজুর রসে বেরিয়ে আসতো পৌষের ভোর, আম্মার ধূসর কার্ডিগান। নানার হাতের লজেন্স চুইংগাম আমার কোনদিন খাওয়া হয়নি। রাতে হারিকেনের টিপটিপ আলোয় আম্মাকে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাদের মতো লাগতো। আম্মার প্রত্যেকটা কথা তখোন বিশ্বাস করতাম কোরানের মতো। আম্মা প্রায়ই বলতেন, নানা থাকেন আজিমপুরের মরিচক্ষেতে।

...ইয়া লম্বা, ছিপছিপে কালো
ভাবতুম, নানারা বুঝি অমনই হয়।
কংক্রিটের যাপনে এখোন আর আম্মার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।
তবুও মরিচক্ষেত দেখলে থমকে দাঁড়াই...

ওয়াসিফা জাফর অদ্রি

ইঁদুরের গর্তে বাবা

ইঁদুর আমাদের কাপড় কেটে ফেললে
বাবা ইঁদুর মারার বিষ আনতেন,
মা সাদা ভাতের সাথে সেই বিষ মাখিয়ে রাখতেন ঘরের আনাচে কানাচে।
বিষমাখা ভাত খেয়ে আধমরা ইঁদুরগুলো হাঁপাতো,
আর তাদের বুক এত জোড়ে ধুকধুক করতো
যেনো হৃদপিন্ড বেড়িয়ে আসবে এখনই।
আমি পানি নিয়ে দৌড়াতাম ইঁদুরের পেছনে,
ওদের পানি খাওয়াতে।

বাবা শেষবারের মত অসুস্থ হয়ে পড়লে আর
তার বুক জোড়ে জোড়ে ধুকধুক করলে,
মনে হচ্ছিলো যেনো হৃদপিন্ড বেড়িয়ে আসবে এখনই।
মা পানি নিয়ে দৌড়াতে থাকে বাবার পেছনে
তাকে শেষবারের মত পানি খাওয়াতে।

কেউ বোধয় বিষ দিয়েছিলো বাবাকে
বাবা, তুমি কার কাপড় কেটেছিলে?

অমোঘ রায়

নির্বাচিত দায়

কবিতার ব্যাভিচারী সংকীর্তনে-
নিপুণ কারিগরি;
অচ্ছুৎ;বালাই ষাট;
মুহুর্মুহু ঝড়ে যাচ্ছে ঝাঁঝালো মগজে।

নিবিষ্ট এক মন;
আরামের তাগিদ'কে আর অস্তিত্বের জানান'কে
Y=mx+C ধরে
ক্রমশঃ নিগূঢ় আস্ফালন রচে, ঠিক মেলার প্রারম্ভে-
V=u-at ফর্মুলায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

পোটেনশিয়ালের গতিবেগ যতই থাকুক-
কবিত্বের নান্দনিক মন্দন ছুঁইয়ে; বালছেড়া
কাটাকুটি; সময়ের সীমারেখায় কতোটা অযাচিত!

হা হা!

বিশেষ দ্রষ্টব্য-
কবিতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছেন যারা-
সমবেদনার গ্রাফিক্যাল সন্নিবেশে;
হাসির গণসংখ্যা নিবেশন সারণী'তে-
সংক্রমণ ছুঁয়ে গেলে
এর ভ্যাক্সিন ফর্মুলা বের করা-
প্রত্যেক কবির দায়িত্ব।

অনিন্দ্য অর্ক

গাধা এবং ঘোড়া

উপভোগ করি প্রাত্যহিক যাপন, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক।
যেমন করে ঘোড়াটিও এড়িয়ে যায় - মালিকের চাবুক;
তুলে ধরে দু'পা শূন্যে জানান দেয় - শুনুন মহাশয়
আমিই চড়াচ্ছি আপনাকে, আপনি আমাকে নয়!

এমন স্পষ্ট বক্তব্য গাধার থেকে আসার মতোন নয়।
যদি আসে?
ধরে আনো ওটাকে, ফেলে দাও ব্যাটাকে ছোট্ট কারাগারে;
খড়কুটোও ওর জন্য বরাদ্দ নয়।

এমন স্পষ্ট বক্তব্য গাধাদের থেকে আশা করা যায় না নিশ্চয়ই!
ওরা বোঝা বইবে, চাবুকের আঘাতে অস্পষ্ট শব্দ করবে;
যেন আর্তনাদটুকু বুঝে না ফেলে অন্য গাধারা
এবং
এটাই ওদের পরিচয়।

আর,
ঘোড়া প্রসঙ্গে ভাবাটা অযৌক্তিক-
বসে থাকে, সারাদিন ঘাস খায়, ঝিমায়,
প্রয়োজনে দৌড়ায়!
অথচ ঘুরে ফিরে সন্ধ্যাবেলা সেই খোঁয়াড়ে গিয়েই শুতে হয়,
সামান্য স্বাধীনতার জন্য বন্দী ঘোড়াটার কতো বেকার অভিনয়!

এমনই তো হতে হয়....

সাজিদুর রহমান

*

তুমি গান শেখো না- কাউকে বলেছিলাম বিকালে। সন্ধ্যায় মার্সিডিজে চেপে একদল সুদর্শন পুরুষ ভাঙ্গা রাস্তায় করাত দিয়ে আমার আঁকা আল্পনাটা পিষে দিয়ে, গিয়ে দাঁড়ালো একটি বাড়ির সামনে। আমি সেসময় পাড়ার বখাটে ছেলেটার সাথে চোটগ্রস্ত গোড়ালিতে ব্যান্ডেজ বাঁধছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় মেয়েটির গায়ে হলুদ হয়েছিলো। লোডশেডিং আমার বরাবরই প্রিয়, নাকফুল তার-ও অধিক। সেদিন রাতে টলমলে চাঁদ ছিলো। গেছো ইঁদুরটা, শেয়ালগুলো সে রাতে হুল্লোড় করেনি- কী কারণে? জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। পরদিন সকালে ব্যান্ডপার্টির পেছনে পেছনে ছুটতে দেখলাম সবগুলো মোমবাতিদের! দুপুরে কানফাটানো সানাই বেজেই চলছিলো, এত বিকট শব্দে আমি ভাত খেতে পারি না। এদিকে সেদিন জ্বলজ্বল করে উঠছিলো দুপুর। সিগারেটের কৌটাটাও নিখোঁজ ছিলো আর তখন মহাবিশ্বেও দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে একটি রমণীর গানের গলা ভেসে আসছিলো ফটক দিয়ে।

বরাবরই জেনেছি বিকাল প্রতারক। রোদ, গোধূলি-মুখস্তবিদ্যা, এমনকি ফেব্রুয়ারিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। ধীরে সন্ধ্যা- কনে বিদায়, কান্নাকাটি পর্ব চলতে চলতে গানও শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

অবিশ্বাস হলেও সত্য- এমন একটি বিকেলে কাউকে গান শিখতে নিষেধ করেছিলাম। যদিও মেয়েটি অতিশয় সুশ্রী ছিলো না। সামান্য শ্যামলা; তার একটিমাত্র খুঁত ছিলো- সে জন্মগত বোবা।

*

এক কোপে তোমার অলস প্রেমিক পুরুষ কেটে ফেলতে সমর্থ হলে জারুল গাছ- সে কখনোই তোমাকে ভালোবেসে উঠতে পারেনি। তুমি তার নাম দিতে পারো ঘাতক। সে তোমার মাংসে কখনো হাত রেখে জ্বরের পরিমাণ বলে দিলে, তাকে বিশ্বাস করো না আর। তাকে ডাকতে পারো হত্যাকারী। বিশেষত সে জানতো- তুমি কোন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরো, হিসাব অনুযায়ী সে এটাও জানতো- তোমার নেইলপলিশ টেকসই নয়। তুমি বারবার তার সামনে খুলে দিয়েছো নাভী অথচ দেখতে পাওনি তার পাঁজরের হাড়ে একটি ছিদ্র। ঐ গর্তে সে পোষে ক্যাকটাসের যন্ত্রণা, হারগিলা, এক ডজন সজারু। তুমি তাকে প্রতারকও বলতে পারো, মিথ্যাবাদীও বলতে পারো। আদতে সত্যিই সে বিশ্বাস করতো না তোমার দীর্ঘ লম্বা চুলে দৌড়ায়নি পুরুষের খসখসে তালু। তুমি তাকে ছেড়ে চলে আসতে পারো, যেহেতু সে তোমাকে কখনো চুমু খায়নি।

মুখ ফিরিয়ে নাও, ঘুরে দাঁড়াও, ময়ূরী! খোঁজো নতুন পুরুষ- যার বুকের ছিদ্রে গর্তের পরিবর্তে রয়েছে আলতার বাটি। তবে স্মরণে রাখলেও রাখতে পারো- ঐ অলস প্রেমিক পুরুষটির সত্যি ছিলো একজোড়া পোষা কবুতর।

অনিক রায়

হৃদপিণ্ডের পোস্টমর্টেম

তোমাকে ভালোবাসবো বলে
আমার আত্মহত্যার তারিখ প্রতিদিন
আপনা-আপনি পিছিয়ে যাচ্ছে।